সারদা-প্রসন্নতাধারায় সারদাপ্রসন্ন

মধুমিতা ঘোষ

বাবা শিবকৃষ্ণ মিত্র দেবী দুর্গার প্রসাদে পাওয়া ছেলের নাম রাখলেন সারদাপ্রসন্ন। 'ছেলেধরা মাস্টার' মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বছর উনিশের প্রিয় ছাত্রটিকে একদিন নিয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। অয়স্কান্ত মণিটির অমোঘ আকর্ষণ এড়ানোর সাধ্য কী! শুরু হল যাতায়াত। শুরু হল সাধুসঙ্গ।

সালটা ১৮৮৪। বাড়ির অভিভাবকদের বড়ই আপত্তি ছেলের পাগলা বামুনের সঙ্গ করাতে। বরানগর বাজার থেকে বিডন স্কোয়ার পর্যন্ত শেয়ারের গাড়িতে ফিরতে চার পয়সা লাগে। বাবার ভয়ে কাতর সারদাপ্রসন্ন বাড়ি ফেরার সে-পয়সা পায় কোথায়? বিপদভঞ্জন শ্রীরামকৃষ্ণ নিদান দেন হয়তো এই বলে—"দূর ছোঁড়া, অত চিন্তা করিস কেন? ওই ন'বতের লক্ষীর ঝাঁপি থেকে চারটে পয়সা কি মিলবে না?" নেপথ্যচারিণী লজ্জাশীলা সারদা দেবী তাই ছেলে সারদার পারানির কড়িটি নহবতের দোরগোড়ায় রেখে দেন। যথাকালে ঠাকুরের আদেশে সারদাপ্রসন্ন সেখানে আসামাত্র বিনা প্রার্থনায় পয়সা-কটি পেয়ে যায়।

আরও কিছুদিন কাটে। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের ফলে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ে। এরপর একদিন নিশ্চয়ই উঠেছিল দীক্ষার প্রসঙ্গ। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাপ্রসন্নকে পাঠান শ্রীশ্রীমায়ের কাছে। আর ইঙ্গিতে মায়ের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বলেন :

অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।
কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়॥

তবে ঠিক তখনি নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর সারদাপ্রসন্ন মাতাঠাকুরানির কাছে মন্ত্রলাভ করেন ও নানাসময় মায়ের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে তাঁর সেবার সুযোগ লাভ করেন।

১৩০০ সালের মাঘ মাসের দিকে সদ্য কন্যাহারা বলরাম বসু-পত্নী কৃষ্ণভাবিনী দেবীর আন্তরিক অনুরোধে মা তাঁর সঙ্গে বিহারের কৈলোয়ারে যান। স্থান ও বায়ু পরিবর্তন এবং সেইসঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে মায়ের সান্নিধ্য হয়তো সন্তানশোকের তীব্র জ্বালা খানিকটা কমাতে পারে—এই ছিল বসুপরিবারের মনোভাব। কৃষ্ণভাবিনী দেবীর জননী, গোলাপ-মা, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী যোগানন্দ ও তাঁর পিতা নবীনচন্দ্র চৌধুরী সহ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দও ওই ভিন্ন পরিবেশে মাস দুয়েক মায়ের সান্নিধ্য লাভ করেন।

এছাড়া ১৩০৪ বঙ্গাব্দের শেষ থেকে মা যখন ১০/২ নং বোসপাড়া লেনে বাস করছিলেন তখন মায়ের সেবার জন্য স্বামী যোগানন্দ তাঁর কাছে থাকতেন আর উদ্বোধনের কাজকর্মের অবসরে মায়ের অমোঘ টানে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দও প্রায়ই সেখানে আসতেন।

১৮৯৯ সালের ২৮ মার্চ যোগীন মহারাজের প্রয়াণের পর ১০/২ বোসপাড়া লেনের বাড়িতে তাঁর কাছে সেবক কৃষ্ণলাল আর রাত্রে সারদা মহারাজ নিয়মিত থাকতেন। দ্বারপাল হয়ে মাতাঠাকুরানির দ্বাররক্ষা ও মাতৃগৃহের কর্মাধ্যক্ষের ভূমিকাও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল।

বেলুড় মঠের দিনলিপি থেকে জানা যায়—১৯০০ সালে শ্রীমায়ের একবার কলেরা হয়। সেই দুঃসংবাদ পেয়ে সারদাপ্রসন্ন জয়রামবাটী যান ও দিনকয়েক সেখানে থাকেন। যোগীন মহারাজ, সারদা মহারাজ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানেরা স্বভাবগুণে ও আন্তরিকতায় মায়ের আত্মীয়-পরিজনদের এতটাই কাছের হয়ে উঠেছিলেন যে শ্রীমায়ের মা অর্থাৎ দিদিমা শ্যামাসুন্দরী দেবী ভাল চাল ইত্যাদি পেলে গুছিয়ে-গাছিয়ে সঞ্চয় করে রাখতেন আর স্নেহঝরা কণ্ঠে জানাতেন : ''আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার। আমার সারদা হয়তো কখনও আসবে, যোগীন আসবে; এসব দরকার।"

সারদামায়ের প্রতি সারদাপ্রসন্নের ছিল অশেষ ভক্তি ও বিশ্বাস। তারই কয়েকটি নমুনা।

দৃশ্য এক :

১২৯৭ সালের কার্তিক মাস থেকে ১৩০০ সালের প্রথম পাদ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল দেশে কাটিয়ে সারদা মা আষাঢ় মাসে কলকাতায় আসেন। বেলুড়ে গঙ্গাতীরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে মা তখন বাস করছেন। বর্ষা গিয়ে শরৎ এসেছে। গাছভরা স্নিগ্ধ শিউলি বাসন্তী বৃন্তের আভা মেখে শেষ রাতের শিশির-ছোঁয়া পেয়ে ঝরে পড়ে মাটিতে। আহা! এত সুন্দর ফুল ধুলোয় পড়ে মলিন হবে! মায়ের নিত্যপূজায় সবকটি যদি নেওয়া যেত! তাই সেবক সারদাপ্রসন্ন পরম নিষ্ঠায় প্রতিটি সন্ধ্যায় শিউলি গাছের তলায় একখানি পরিষ্কার কাপড় পেতে রাখেন, যাতে শেষরাতে ঝরা অ-মলিন স্নিগ্ধ পবিত্র ফুলগুলিকে মা পূজায় নিবেদন করতে পারেন।

শেফালিকা-পুষ্প প্রীতি সারদাপ্রসন্নের আজীবন। সেই সুরভি মেলে ১৮৯১ সালের কোনও এক সময় বৃন্দাবনের কালাবাবুর কুঞ্জ থেকে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা এক পত্রে—''... আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চুনারে আসি। তথায় 'দুর্গাখো' নাম্নী দেবীর স্থান দর্শন করিয়া যার পর নাই প্রীতি লাভ করি। তথাকার পাহাড়গুলি কেবল শেফালিকাবৃক্ষে আবৃত। সেই পুষ্পে যথা তথা সকল স্থানই অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভিত দেখিলাম। সুগন্ধে দিকসকল আপূরিত। বোধ হইল যেন বায়ু পুষ্পের রেণুতে অতীব ভারাক্রান্ত হওয়ায় বেগে গমন করিতে পারিতেছিল না, সেইজন্যই অত গন্ধ ছিল। কেন না প্রভাতাগমেই শেফালিকা ক্রমশ গন্ধশূন্য হইয়া যায়। অথবা হয়ত দেবী প্রসন্না হইয়া অনাগতপূর্ব ভক্তকে এত শোভা দেখাইলেন। যাহাই হউক, যতদূর যাইতে লাগিলাম ততই হৃদয়ে উত্তরোত্তর পুলক বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। স্থানটি যথার্থই স্বর্গীয় বলিয়া অনুভূত হইল। বস্তুতঃ কোন নরলোকের বাস দেখিলাম না। চতুর্দিকেই কেবল প্রসূনিত বহুশাখাবিশিষ্ট সুখর্ব্ব শেফালিকা-বৃক্ষের অচল বাসস্থান। জগদম্বা ভগবতীর আর একটি নাম 'শেফালিকা' এবং ইহাও জনশ্রুতি আছে যে শেফালিকা-বৃক্ষতলে ভগবতী সদাই বাস করেন, সেইজন্যই পুষ্পগুলি ভগবতীর অর্ঘ্যস্বরূপে আত্মনিবেদন বলিয়াই নিম্নে পতিত হইল। সাক্ষাৎ ভগবতীর বাস না হইলে তথায় অত

শেফালিকাতরুরাজির প্রাদুর্ভাব কেন।" নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে শরৎপ্রভাতে শেফালিকা পুষ্পের সান্নিধ্য ও স্বয়ং সারদা দেবীর সান্নিধ্য সারদা মহারাজের মনকে নিশ্চয়ই আরও একবার স্বর্গীয় মধুরিমার আস্বাদ দিয়েছিল—একথা বলাই বাহুল্য।

দৃশ্য দুই :

এবারের ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে পাগলামিরই নামান্তর।মা সেবক সন্তানকে বলেছেন ঝাল লঙ্কা আনতে। মাতৃ-আজ্ঞা বলে কথা। জিনিসটা ঠিক ঠিক হওয়া চাই। সুতরাং যথাযথ আজ্ঞাপালনে চলল ছেলে। বাগবাজার থেকে লঙ্কার স্বাদ পরীক্ষা শুরু হল—প্রকৃতই ঝাল কি না যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন। ঠাকুর না বলেছেন, ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন? বেশ যাচিয়ে বাজিয়ে নেওয়া চাই। Test আবশ্যিক। এক্কেবারে taste করে কান ঝাঁ ঝাঁ করা আসল ঝাল লঙ্কা নিয়ে যেতে হবে মায়ের কাছে। তাই এ-দোকানে ও-দোকানে লঙ্কার 'ঝালত্ব' চাখতে চাখতে হাঁটতে হাঁটতে বাগবাজার থেকে বড়বাজারে হাজির 'chilli-taster'। শেষে সেখানেই পাওয়া গেল ঠিক ঠিক মনোমতো ঝাল লঙ্কা। ততক্ষণে জিভ বেচারা নিশ্চয়ই ত্রাহি-ত্রাহি রব ছাড়ছে। তবে শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ বলে কথা! ত্রি-গুণের প্রভাবাতীত হওয়াতেই আনন্দ তাঁর। লঙ্কা-দহন-জ্বালা তো তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার! 'ত্রিগুণাতীতানন্দ' নাম সত্যিই সার্থক।

দৃশ্য তিন :

১৮৯৯ সালের আগস্ট মাস। মা চলেছেন কলকাতা থেকে জয়রামবাটীর দিকে—বর্ধমান হয়ে। দামোদর পার হয়ে পালকির অভাবে গোরুর গাড়িতে করেই মাকে যেতে হচ্ছে। সারদা মহারাজ লাঠি কাঁধে গাড়ির আগে আগে হেঁটে চলেছেন। মায়ের মন বিষাদাচ্ছন্ন। সন্তান যোগানন্দ স্বামীর অকাল প্রয়াণ ও উপযুক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়কুমারের বিসূচিকা রোগে অকস্মাৎ দেহত্যাগ ঘটেছে। রাত্রি তৃতীয়প্রহর। শোকভারে ব্যথিতা মা একসময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন।

সারদা মহারাজ চলতে চলতে হঠাৎ দেখতে পেলেন রাস্তার খানিকটা অংশ বানের জলে ভেঙে গিয়ে এমন একটা খানা তৈরি হয়েছে যে তার উপর দিয়ে গাড়ি যেতে গেলে চাকা ভেঙে যাওয়ার ও আরোহীর আহত হওয়ার সম্ভাবনা। কোনও দিক না ভেবে চকিতে সারদা মহারাজ তাঁর স্থূল শরীর নিয়ে ওই খানার উপরে শুয়ে সেতু তৈরি করলেন—ইচ্ছা মায়ের গাড়ি চলার পথটাকে মসৃণ করার। একবারও তিনি ভাবলেন না, তার ফলে তাঁর গুরুতর আহত হওয়ার সম্ভাবনা। তেমনটা ঘটলে ওই জনমনিষ্যিশূন্য স্থানে গভীর রাতে আর এক বিপদ ঘটতে পারে। যাই হোক, ভাগ্যক্রমে অকস্মাৎ শ্রীমার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় ও চন্দ্রালোকে ঘটনা-পরিস্থিতি দেখে মা সন্তানের একইসঙ্গে ত্যাগ ও হঠকারী মনোভাব বুঝে দ্রুত গাড়ি থেকে অবতরণ করে তাঁকে নিবৃত্ত করেন এবং যুগপৎ ভর্ৎসনা ও আশীর্বাদ জোটে সন্তানের ভাগ্যে।

এইভাবে দিনে দিনে সারদামায়ের সান্নিধ্য সারদা মহারাজকে নিশ্চয়ই মায়ের স্বরূপ উপলব্ধিতে সাহায্য করেছিল। আর সেইসঙ্গে দেবীত্ব ও মানবীত্ব কীভাবে একাকার হয়ে উঠতে পারে তারও সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করতে থাকেন তিনি। তা না হলে মনে হয় উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ত্রিগুণাতীতানন্দজীর লিখিত 'আনন্দময়ীর আগমন' ও 'বিজয়া' প্রবন্ধদ্বয়ের ওই ভাব-ঐশ্বর্য প্রকাশিত হতে পারত না। হৃদয়ের সাক্ষাৎ উপলব্ধি ছাড়া এমন আন্তরিক ঘরোয়া লেখা অসম্ভব।

দেবী দুর্গাকে ঘরের মেয়ে কিংবা মা বলে মনে করা আমাদের ঐতিহ্য হলেও কোন অচিন সোনার কাঠির ছোঁয়ায় উক্ত রচনাদ্বয় এত প্রাণস্পর্শী, এত

জীবন্ত, এত মধুর হয়ে উঠল! জ্যান্ত-দুর্গার সতত অচিন-সান্নিধ্য সেই জাদুকাঠি নয় তো!

'আনন্দময়ীর আগমন'[১]—এ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ লিখছেন : ''... মা আমাদের কত দয়াময়ী! কতই স্নেহময়ী!... বেশী দিন ছেলেকে না দেখে কি থাক্‌তে পারেন? তাই মায়ের অত সজল নয়ন। স্নেহময়ী স্নেহে এত ভরা না হলে কি এ-সকল অস্ফুট শুষ্ক সন্তানদিগের ভিতরে স্নেহের উদ্রেক করে দিতে পারেন? মায়ের নিকট হতেই এক অবিরত ধারায় স্নেহ পাইয়া ত আমরা অপরকে কিঞ্চিৎ স্নেহের চোখে দেখ্‌তে শিখেছি।...

''আমাদের মা ত খালি মাটির বা খেলা-ঘরের মা নয়। শুনেছিলাম, এখন বিশ্বাসও হয়েছে—আমাদের মা শুনতে পায়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। আমাদের মা সর্ব্বমঙ্গলা, অন্তর্যামিনী, সর্ব্বশক্তিমতী, সর্ব্বশক্তিস্বরূপা।...

''...মা সত্য আছেন, মা নিত্যই আছেন; মা সত্যই অন্তর্যামী, সত্যই ভক্ত-বৎসল, সত্যই স্নেহময়ী জননী। ছেলে প্রাণের সহিত ডাকলে মা আসবেন্‌ই আসবেন্‌, কোনও সন্দেহ নাই।''

আবার 'বিজয়া'তে[২] যেন মায়ের রূপেরই ভাবঘন প্রকাশ : ''...জেনেছি সকলকারই সেই একই মা; আমরা সেই একই মা'র সন্তান। যে সে মা নয়,—ব্রহ্মময়ী। আমরা ব্রহ্মময়ীর সন্তান। খোলো—চোখ খুলে দেখ; স্পষ্ট করে দেখ;—অন্তরে কে সজল নয়নে বসে আছেন। একটু বিস্তার কর; দেখ—সেই মা'ই সকলকারই ভিতর বিরাজ করছেন। মার কাছে ছোট বড় নাই; ভাল মন্দ নাই; কাওরা হাড়ি নাই; হিন্দু মুসলমান নাই। মা যে আমাদের ব্রহ্মময়ী—মার কাছে সব ছেলেই সমান।''

দেবী দুর্গা না সারদা দেবীর কথা এখানে বর্ণিত হচ্ছে—প্রবন্ধের নাম কিংবা বিষয়বস্তু বিষয়ে আগে থেকে সচেতন না হলে মনে ধন্দ জাগবে।

মাঘ ১৩০৫ থেকে পৌষ ১৩০৯ পর্যন্ত চারবছর ধরে উদ্বোধন সম্পাদনার কাজ যথাযথভাবে পালন করলেন ত্রিগুণাতীত মহারাজ। এরপর উদ্বোধনের উদ্বন্ধন মুক্ত হয়ে সুদূর আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো যাত্রার আদেশ পেলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারের ধারাটিকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে হবে যে!

৪ জুলাই, ১৯০২। মহাপ্রয়াণ ঘটল স্বামী বিবেকানন্দের। ঘটনার আকস্মিকতার ঘোর যেন কাটছে না। কিন্তু নেতার আদেশ যে অনতিক্রম্য! ভগ্ন মনে তাই পাড়ি দিতে হল মার্কিন দেশে। ২ জানুয়ারি ১৯০৩ জাহাজ সানফ্রান্সিসকো পৌঁছল। কঠোর নিয়মনিষ্ঠা, অপরিসীম ধৈর্য, নিরলস কর্মপ্রবাহের মাধ্যমে 'ডাকাবুকো', 'বজ্রবাঁটুল' মানুষটি অব্যাহতভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে গেলেন। পাশ্চাত্যের গ্রহীষ্ণু, আগ্রহী মানুষদের মধ্যে সঞ্চার করলেন ধর্মবোধ। সত্যে সুকঠিন মানুষটি কিন্তু 'মা'-কে ভোলেননি একবারও। মাকে চিঠি লিখছেন, খবরাখবর নিচ্ছেন। মায়ের তৎকালীন অবস্থানাদি ঠিকঠাক জানা না থাকলে পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো চিঠির মধ্যে ঠিকানাহীন খামে শ্রীমাকে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

অতুলকৃষ্ণ দাসকে ১১ জানুয়ারি ১৯১০-এর পত্রে লিখছেন : ''শ্রীশ্রীমা'র পত্রখানিতে ঠিকানা লিখিয়া, ডাকটিকিট মারিয়া ডাকে ফেলিয়া দিবে। তা উনি কলকাতাতেই থাকুন, আর জয়রামবাটীতে থাকুন।'' কখনও বা অনুরোধ করে পত্র পাঠাচ্ছেন স্বামী সারদানন্দকে : ''শ্রীশ্রীমা যেখানে আছেন, সেখানকার ঠিকানা খামে লিখে তাঁর চিঠিখানি অনুগ্রহ করিয়া ডাকে ফেলিয়া দিও।''[৩]

দৈনন্দিন যাপনে অতি মিতব্যয়ী, কার্পণ্য-গুণে গুণী মানুষটি কিন্তু সুদূর পাশ্চাত্যে কাজ করতে করতেও মায়ের একটু স্বাচ্ছন্দ্যের ভাবনায় অত্যন্ত ব্যাকুল। তবে সে-বিষয়ে আলোচনার আগে

ত্রিগুণাতীতানন্দজী ভোগবহুল পাশ্চাত্যেও তাঁর জীবনযাপনে কতটা কষ্টসহিষ্ণু, তিতিক্ষু এবং নিজের ব্যাপারে কতটা মিতব্যয়ী ছিলেন তার দু-একটা উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাক—এ যেন স্বামীজীরই কথা 'গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে'-রই মূর্ত রূপ।

ডা. স্বর্ণকুমার মিত্র, যিনি মার্কিন মুলুকের ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গিয়ে ১৯১০ সালের ৩ বা ৪ অক্টোবর ত্রিগুণাতীত মহারাজের প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং পরবর্তী কালে নানা সহায়তাও পান, তিনি উদ্বোধন পত্রিকায় 'স্বামী ত্রিগুণাতীত মহারাজ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ' প্রবন্ধে লিখেছেন :

''একদিন ছোট স্বামীজীকে (স্বামী প্রকাশানন্দ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'বড় স্বামীজীর শোবার ঘর কোথায়?' তিনি উত্তর করিলেন, 'ওখানেই।' অর্থাৎ অফিস কামরাতেই। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওঁর বিছানাপত্র কোথায়?' তিনি বলিলেন, 'ওঁর বিছানার দরকার হয় না, উনি সন্ন্যাসী!' সত্যই তাঁহার কোন বিছানা ছিল না।''[৪]

আর খাওয়া দাওয়া? ওই প্রবন্ধ থেকেই জানা যায় : ''তাঁহাকে কখনও আমিষ খাইতে দেখি নাই বা শুনি নাই। তিনি স্বপাকে খাইতেন। মন্দিরের অন্যান্য সকলের খাওয়া একত্র হইত, কিন্তু তিনি অপর একটা কামরায় নিজে রাঁধিয়া খাইতেন, ছোট স্বামীর (স্বামী প্রকাশানন্দ) নিকট শুনিয়াছি তিনি রোজ পাক করিতেন না এবং একবেলাই পাক করিতেন। একাহারীই ছিলেন, তবে রাত্রে সামান্য কিছু জলযোগ করিতেন।''[৫]

আর ত্রিগুণাতীতানন্দজীর ১৭ আগস্ট ১৯০৬-এর পত্র থেকে জানতে পারি, আর্থিক কৃচ্ছ্রতার কারণে চিঠি লেখার জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন ছোট কাগজ ও পেন্সিল : ''এরকম ছোট কাগজে ও পেন্সিলে চিঠি লেখা যে দস্তুর নয়; তবে আমি এরকম করিতেছি পয়সা ও সময় সাশ্রয় করিবার জন্য...।'' অবশ্য পাছে তাঁর এই আর্থিক অনটন পত্রপ্রাপক অর্থাৎ আত্মীয়সম ঘনিষ্ঠজন পূর্ণচন্দ্র শেঠ মহাশয়কে ব্যথিত করে, তাই ছেলেমানুষি যুক্তি দিয়ে আশ্বস্তও করছেন তাঁকে : ''...তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না।... এ কাগজ ও এ পেন্সিল খুব দামী।''

সঙ্ঘের জন্য সন্ন্যাসধর্মের অবিরোধী নানা উপায়ে অর্থসংস্থানে নিরত, নিজ জীবনযাপনে সদা কৃচ্ছ্রতাপরায়ণ মানুষটিই আবার সন্ন্যাসধর্মের একেবারেই ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মায়ের এবং কেবলমাত্র মায়ের জন্যই। সন্ন্যাসী হয়ে সঞ্চয় করেন, গোপনে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলান দেশে থাকা নিকট বন্ধুস্থানীয় একান্ত নির্ভরযোগ্য অতুলকৃষ্ণ দাসকে দিয়ে। অনেক রাখঢাক করেন সে নিয়ে। হয়তো এই রাখঢাকের মধ্যে তাঁর স্বভাবগত রহস্যপ্রিয়তাও খানিকটা কাজ করছে, তবুও সে এক অদ্ভুত কীর্তিকলাপ। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর হৃদয়-মন-প্রাণসর্বস্ব আত্মারামকে যোগোদ্যানে প্রেরণে কুণ্ঠিত শশী মহারাজ ও নিরঞ্জন মহারাজ যেমন ভস্মাস্থি সরিয়ে রেখে আমাদের পরমকাঙ্ক্ষিত কাজের জন্য চৌর্যাপরাধে অপরাধী হয়েও চিরপ্রণম্য, যেমন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী শশী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসেবাপূজা ও গুরুভাইদের নিরন্ন মুখে একগ্রাস অন্নসংস্থানের ব্যয়নির্বাহের জন্য সন্ন্যাসী হয়েও শিক্ষকতার চাকুরি নিয়ে জীবিকাগ্রহণের ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; তেমনি মায়ের জন্য ত্রিগুণাতীত মহারাজের এই ব্যতিক্রমী কীর্তিটি উপরিউক্ত ঘটনাগুলির সঙ্গে সমমর্যাদার স্থান লাভ করে।

সানফ্রান্সিসকো থেকে ১১ জানুয়ারি ১৯১০ ত্রিগুণাতীতানন্দজী পত্র লিখলেন অতুলকৃষ্ণ দাসকে। তার শুরুর দিকটা এইরকম : ''এই পত্রের ভিতর ৩০০৲ (তিনশত টাকা)র কিছু উপর তোমার নামে পাঠাইলাম। ইহা খবরদার কাউকে বলিও না। মঠের কারুকেও বলিও না। চুপিচুপি পোস্ট অফিস

সেভিংস ব্যাঙ্কে তোমার নামে জমা রাখিবে। রাখিয়া আমাকে একখানা official চিঠি লিখে দেবে যে উক্ত ব্যাঙ্কে তোমার নামে যা যখন টাকা থাকিবে তাহা আমার এবং তোমার অবর্তমানে আসিয়া আমার অন্য কোনও এজেন্ট ওই টাকা বাহির করিয়া লইতে পারিবে।" এই অংশটুকু পড়ে প্রাথমিকভাবে অবশ্যই ধন্দ লাগবে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, ত্যাগীসম্রাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানের এ কী মতিভ্রম! এ যে আমাদের কাছে এক বিরাট মানসিক ধাক্কা!

একটু থতমত খেয়ে ওই পত্রেরই পরের অনুচ্ছেদটা পড়তে পড়তে আস্তে আস্তে বুকের পাথরচাপা ভাবটা কাটতে শুরু করে : ''ঐ টাকা হইতে প্রতি মাসে ৫্ মঠের ঠাকুরের নিত্য সেবার জন্য দিয়া আসিবে এবং ৫্ টাকা মঠের মাসিক খরচের সাহায্যস্বরূপ দিয়া আসিবে। আর পাঁচ টাকা মাকে (পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে) দিয়া আসিবে...।" এরপরই সারদামায়ের সারদাপ্রসন্ন বিশেষভাবে যোগ করলেন : ''...ইহা যেন তাঁর নিজের হাতে পড়ে, বলিয়া দিবে ইহা তাঁর নিজের জন্য।" এই নির্দেশটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হননি তিনি, আরও জানাচ্ছেন : ''আমি তাঁকে পত্র এইভাবে লিখিয়া দিয়াছি। তিনি যদি জয়রামবাটী বা অন্যত্র থাকেন ত ডাকের money order করে দিবে। এবং আর ৫্ লইয়া যিনি শ্রীশ্রীমার সেবার খরচের প্রধান অধ্যক্ষ (বোধ হয় সারদানন্দ স্বামী), তাঁর হস্তে শ্রীশ্রীমার নিত্য সেবার জন্য বলিয়া দিবে।"

অতুলকৃষ্ণকে লেখা ২৩ ডিসেম্বর ১৯১০-এর পত্রে আবারও ওই একই বিষয়ের অবতারণা। আর সেইসঙ্গে মাতৃগতপ্রাণ সন্তানের মাতৃস্বরূপের কিঞ্চিৎ উন্মোচন : ''শ্রীশ্রীমা'র মাসিক ৫্ যেন তাঁর নিজের হস্তে পড়ে। যদিচ, তিনি জগৎলক্ষ্মী, জগৎ তাঁর ভাণ্ডার; তথাচ এ দাসের নিকট হতে 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং' যা হয় যৎ কিঞ্চিৎ পঞ্চোপকরণ যেন মা জগদম্বার হাতেই পড়ে। আর এই পাঁচ টাকার কথা যেন কেহ না জানে। না-কি already বাজারে ঢাক বাজিয়ে দিয়েছ কত্তা! অপর ৫্, যাহা শ্রীশ্রীমা-র দৈনিক স্ত্রী-সেবিকাগণের সেবার জন্য, অর্থাৎ তাঁর কাছে যেসব স্ত্রীভক্ত থাকিবে, কলিকাতাই হউক বা জয়রামবাটীতেই হউক, তাঁদের সেবার জন্য, অর্থাৎ মা যেখানে থাকবেন সেখানকার সংসার চালাইবার আংশিক—মাসিক খরচের জন্য।" সঙ্গে সাবধানতামিশ্রিত চেতাবনি : ''ইং ১৯১২ খ্রিঃ-এর ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত, মাসিক ২০্ হিঃ যত টাকা হয় তাহা খাতায় পৃথক রাখিবে। তাহা হইতে, আমার বা আর কাহারও জন্য, কিছুতে ধার বা কর্জ্জ দেওয়া স্বরূপেও ব্যবহার করিও না। আমি হাজার বললেও সেটি আদৌ ছুঁইও না। বাকি কত টাকা হেফাজতে হাতে থাকে, তাহা পত্রপাঠ লিখ।"

মনে রাখা প্রয়োজন, সালটা ১৯১০। সারদা দেবী তাঁর সন্তান ও অন্তরঙ্গ পরিমণ্ডলে 'সত্যিকারের মা'। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের কাছে মায়ের বিষয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধা, সমীহ থাকলেও বাকি সমাজের কাছে সারদা দেবী 'রামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী' মাত্র। তাই বুঝি মায়ের বিষয়ে সাবধানতা, রাখঢাক ও নানা আশঙ্কা নিয়ে অতুলকৃষ্ণকে সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলেন ত্রিগুণাতীতানন্দজী।

যাই হোক, ২৬ জানুয়ারি ১৯১২ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ত্রিগুণাতীত মহারাজ অতুলকৃষ্ণকে লিখছেন : ''অনেক দিন তোমার পত্র না পাওয়াতে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলাম। মনে করেছিলাম, বোধ হয় আবার বায়ু বদলাতে পশ্চিমে গিয়েছ। সেইজন্য এবারে টাকা শরৎ মহারাজের নিকট directly পাঠিয়েছি...।" মায়ের সেবায় অর্ঘ্য প্রদানে ছেদ যেন না ঘটে। তাই 'মায়ের ভারী' শরৎ মহারাজের কাছেই শেষপর্যন্ত সরাসরি ভারসমর্পণ আর রহস্যময়তা, লুকোচুরির অবলুপ্তি।

একবার মায়ের ঠিকুজি কোষ্ঠীর খোঁজ করা হয়।

নিজের বিষয়ে স্বভাব-উদাসীন মা জানান, ''ওসব ত সারদাই রাখত, তাকে লিখে দেখ দিকি।'' সারদা মহারাজকে চিঠি লেখা হলে তিনি সানফ্রান্সিসকো থেকে সব খবর দিয়ে একটি পত্র দেন মাকে। 'মা ব্রহ্মময়ি' সম্বোধন করে মায়ের 'শ্রীপাদপদ্মে' সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত' জানিয়ে লেখেন : ''মা, আমি ত অনেকদিন হইল হয় দিদিমাকে, না হয় প্রসন্ন মামাকে বা অপর কোনও মামাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলাম।... সে অনেক দিন হইল, এখন ত আমার ঠিক মনে নাই, কাকে ফিরাইয়া দিয়াছি।'' এরপর মাকে তিনি আশ্বস্ত করেন : ''যাহা হউক, যদিও তাহা হারাইয়া গিয়া থাকে, কিছু ক্ষতি তাহাতে হইবে না; কারণ, আমার নিকট আপনার সেই কুণ্ঠির ঠিক-ঠিক নকল এখানে আমার খাতায় তোলা আছে।'' উক্ত ২৮ শ্রাবণ ১৩১৬, শুক্রবারে লেখা চিঠিতে ওই ঠিকুজি কোষ্ঠী নকল করে পাঠান এবং সেইসঙ্গে পাঁচটাকা : ''এই চিঠির ভিতর পাঁচ টাকা আপনার হাতখরচের জন্য পাঠাইলাম।''

বহুদিন আগে নহবতবাসিনী মা তাঁর ছেলের নিত্য পারানির কড়ি চারটে পয়সা নীরবে রেখে দিয়ে তাকে ভয়-চিন্তা মুক্ত করতেন। আর তারপর একসময় মায়ের সাক্ষাৎ সেবক হয়ে ছেলে দেখেছে মা কীভাবে নিজের হাত শূন্য করে তাঁর ভক্ত-ভগবানের সংসারে ব্যয় করে যাচ্ছেন। দেখছেন, মা অন্যের সেবায় অকাতর কিন্তু নিজের সেবায় বড়ই কাতর। তাই ছেলে প্রবাসী হয়েও মায়ের খানিক সচ্ছলতা আর স্বাধীন ইচ্ছামতো খরচের জন্য কিছু টাকা পাঠাতে বড়ই ব্যাকুল। তাই বারবার সেই একই কথা—'তাঁর নিজের হাতখরচের জন্য' কিংবা 'ইহা যেন তাঁর নিজের হাতে পড়ে'।

নারীর স্বাবলম্বনের কথা, তাদের অর্থনৈতিক স্বাধিকারের কথা আজ বহুল আলোচিত বিষয়। নারীর স্বাধীনভাবে 'নিজের হাত খরচে'র জন্য কিছু অর্থের যে প্রয়োজন—এই আধুনিক দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীত এবং তা সেই একশো কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেই। চিরপ্রাচীনা ও চির আধুনিকা মা তো আর চাকরি করতে যাননি; যদিও তিনি খুবই চাইতেন, মেয়েরা লেখাপড়া শিখুক, নিজের পায়ে দাঁড়াক। আধুনিক কালের ভাষা যদি ব্যবহার করি, শ্রীমা সারদা ছিলেন বৃহৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-সংসারের Home-maker এবং পরবর্তী কালে সঙ্ঘ-সংগঠক, Decision-maker, Trouble-shooter। খুব মিষ্টি করে বললে পর্দার আড়ালে থাকা 'গিন্নিঠাকুরুণটি'। তাঁর সেই নীরব-মধুর-শান্ত-সরল-দৃঢ়-ঋজু ব্যক্তিত্বের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তিত্বও ধুলো-পড়া সাপের মতো মাথা নত করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও জানাতে ভোলেন না—''ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।'' তিনিই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শেষ কথা—হাইকোর্ট।

ভাবপ্লাবনে পরনের কাপড়ের ঠিক থাকে না যে মানুষটির সেই 'জগদম্বার বালক' শ্রীরামকৃষ্ণ স্ত্রীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান নিয়ে ভাবিত। তাই বেশ হিসেব-নিকেশ করে 'রামলালের খুড়ি'র ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে যেতে চান তিনি। স্বভাবত্যাগী মানুষটি যতই জগতভোলা হোন না কেন, সহধর্মিণীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য পালনটি তাঁর করা চাইই চাই। না হলে স্বধর্মপালনে বিচ্যুতি ঘটবে যে! তাঁর জীবন যে এক আদর্শ! আবার সোনার ছেলেগুলিও তৈরি হয়েছিলেন সেভাবেই। তাঁরা মাতৃগতপ্রাণ। রাজা-ছেলে নরেন সভায় সর্বসমক্ষে জোরগলায় জানান : ''শ্রীশ্রীমাকে হাতখরচা বাবদ মাসিক ২৫ টাকার কম দিতে পারব না।''

মা ভেবেছেন তাঁদের জন্য, তাঁরা ভাবছেন মার জন্য। এঁরা একে অপরের ভার নিতে ব্যাকুল। স্বাভাবিক ঔচিত্যবোধ, সম্পর্কের শ্রদ্ধা, সংস্কার-ঐতিহ্যের মাধুর্য মানুষের চলার পথকে স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক করে তোলে। কোনওকিছুই ভার হয়ে দাঁড়ায় না।

রক্তের সম্পর্ক বা in law সম্পর্কের বাইরে গিয়েও এ এক অপূর্ব সম্পর্ক-ধারা পুনরুজ্জীবিত হল। এ-সম্পর্ক আত্মিক সম্পর্ক, আত্মার আত্মীয়তা। এ-সম্পর্কের কেন্দ্রে রয়েছে আধ্যাত্মিকতা, রয়েছে অ-লৌকিক, অজাগতিক ভালবাসা—যা কিনা মানবজাতির চিরশ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে-গুণের কারণে মানুষ 'সত্যিকারের মানুষ'।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা দেবী ও তাঁদের সন্তানদের আবির্ভাব ও যাপন বহু নতুন ধারার প্রবর্তন নিশ্চয়ই করেছে। সেসব নবধারার কিছু কিছু আজকের মানুষের বোধগম্য। আবার সেইসঙ্গে একথাও অবশ্যই সত্য, আরও নব নব ধারা ভবিষ্যতের মানুষের কাছে নব নব রূপে অভিব্যক্ত হবে, বোধগম্য হবে, ব্যাখ্যাত হবে, অনুসরণীয় হবে।

আমাদের আলোচিত এই যে আত্মিক সম্পর্কের টান, এই যে আত্মার আত্মীয়তা—এই সেই নব প্রবর্তনার অন্যতম। ''ভালবাসাতেই 'তাঁর' সংসার গড়ে উঠেছে।'' এই ভালবাসা-কেন্দ্রিক সংসার ও জগৎ আজ আমাদের কাছে পরমকাম্য, তা আমাদের আদর্শ। আসলে এটিই প্রকৃত আধুনিকতা। এটিই প্রকৃত প্রজ্ঞা-মনস্কতা।

তথ্যসূত্র

১। *উদ্বোধন,* ১৫ আশ্বিন, ১৩০৬
২। *তদেব,* ১ কার্তিক, ১৩০৬
৩। ২৩ জানুয়ারি ১৯১২-র পত্র
৪। *উদ্বোধন,* আষাঢ়, ১৩৪২
৫। *তদেব*

সংগ্রহ

'কর্ম্মসু কৌশলং'

''...ঠাকুরের কার্য্য করিতেই হইবে, ... ঠাকুর এইরূপ করাইতেছেন, করিতেই হইবে। ধন্য যে, ঠাকুরের কার্য্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। পরমহংসদেব বিড়াল ছানার উপমা দিতেন; আহা কি চমৎকার! ঠাকুর যেখানে রাখিবেন, সেইখানেই থাকিব; ঠাকুর যাহা করাইবেন, তাহাই করিব; ঠাকুর যেন সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকেন, ঠাকুরকে যেন সর্ব্বদাই মনে থাকে। যেখানে থাকি, যাহাই করি, মা আনন্দময়ি, মা ব্রহ্মময়ি, তোমাকে যেন না ভুলি। ইহাই হইতেছে ''কর্ম্মসু কৌশলং'', ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে পড়িয়াও, এইরূপে কর্ম্ম করিলে আর কর্ম্মবন্ধনে পড়িতে হয় না। আমার মাকে যদি না ভুলি, আমার ঠাকুরকে যদি না ভুলি, তাঁরা যদি আমার সঙ্গে থাকেন, তাঁরা যদি আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগরুক থাকেন, তাঁরা যদি আমার হাত ধরিয়া লইয়া বেড়ান, তাহলে আর আমার ভয় কি? ইহাই হইতেছে সিক্‌রেট অভ সক্‌সেস (Secret of success)। ইহাই হইতেছে, যাবতীয় কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবার একমাত্র উপায়। ''ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে''; ব্রহ্মই এক মাত্র জয়লাভ করিতেছেন। তাঁহারই জয়, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ''জয়ন্তী মঙ্গলকালী'' যাঁর হৃদয়ে সর্ব্বদা, তাঁর জয় সর্ব্বত্র। পাঠকবর্গ, প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করুন, যাতে আপনাদিগের এই ভৃত্য এখানে ঐরূপ ভাবে, ঠাকুরকে সর্ব্বদাই হৃদয়ে রাখিয়া, মা ব্রহ্মময়ীকে না ভুলিয়া, ''তাঁহারই কার্য্য করিতেছি, শুভাশুভের ফল তাঁহারই'', এই রূপ ভাব সদা মনে জাগরুক রাখিয়া চলিতে পারে।''

(স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, *'মায়ের এক মনোহর উদ্যান'*, উদ্বোধন, ৬ বর্ষ ২০ সংখ্যা, পৃঃ ৬১০)